গরীব মারার নয়, ধনী বানাবার বাজেট

ডা লি য়া সা ত্তা র
(dalia_satter@yahoo.co.uk)

আমাদের রাজনীতিকদের বাজেট বিষয়ক প্রতিক্রিয়া নিতান্ত একঘেয়ে এবং ছকে বাঁধা। বিরোধী দল হলে বলবে যে, বাজেট করা হয়েছে গরীব মারার জন্য আর সরকারী দল হলে বলবে এবাজেট যুগান্তকারী, দেশের উন্নয়নে এ বাজেট মাইলফলক হিসাবে কাজ করবে ইত্যাদি। বাংলাদেশের ইতিহাসে কোন বাজেট যুগান্তকারী হয়েছে কিনা জানিনা, তবে গত দেড়যুগ ধরে তিনটি সরকারের কোন বাজেটই যে গরীব মারার জন্য তৈরী হয়নি, তার একটি বড় প্রমাণ হচ্ছে, এই সময়ে দেশে দারিদ্রের হার কমেছে। শুধু তাই নয়, লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, প্রতিটি সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে কিছু লোক, যারা আগে ধনী ছিল না, তারা ধনী হয়ে যায়। তাদের চাঁচের বোড়ার জীর্ণ কুটিরের স্থলে আলীশান অট্টালিকা উঠে। মফঃস্বলে বিষয়টি বেশী লক্ষ্য করা যায়। সে কারনে আমাদের বাজেটগুলো যে প্রকারান্তরে ধনী বানাবার বাজেট সে দাবী একেবারে অমূলক নয়। প্রকৃতপক্ষে অধিকাংশ বাজেটে উদ্দেশ্যমূলকভাবেই কিছু লোককে ধনী বানাবার ব্যবস্থা রাখা হয়। নির্বাচন আসলে সে ব্যবস্থাটি আরও জোরদার করা হয় এবং ধনী বানাবার খাতগুলোতে বেশী অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়। যেহেতু সামনে নির্বাচন, তাই বর্তমান বাজেটে এই ব্যবস্থাটি বেশী পরিমাণে আছে বলেই মনে হচ্ছে। অনেকে মনে করেন যে, নির্বাচনী বাজেট খারাপ কিছু নয় যেহেতু সে বাজেট বেশী পরিমানে গনমুখী হয়। ধারনাটি ভুল। জনগনকে সন্তুষ্ট করে তাদের মন জয়ের মাধ্যমে ক্ষমতায় যাবার কৌশল আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো অনেক আগেই পরিত্যাগ করেছে। বরং ভোটে জেতার জন্য তারা প্রশাসনকে হাতে রাখা, অঢেল টাকার মালিক ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সমর্থন লাভ, প্রভাবশালী ও বিত্তবান প্রার্থীকে দলে ভেড়ানো এবং এলাকার মাস্তান, দলীয় ক্যাডার, ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার-চেয়ারম্যানদেরকে দলে সক্রিয় করার দিকে বেশী জোর দিচ্ছে। সাথে থাকে কিছু দরিদ্র মানুষের মধ্যে সরকারী অনুগ্রহ বিতরন করে তাদের ভোট কেনার ব্যবস্থা। ফলে নির্বাচনী বাজেটে উপোরোক্ত গ্রুপগুলোর স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা সবথেকে বেশী গুরুত্ব পেয়ে থাকে।

প্রস্তাবিত বাজেট উপরোক্ত বিষয় বিবেচনায় একটি আদর্শ নির্বাচনী বাজেট। অর্থমন্ত্রী অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে সময় নিয়ে বর্ণনা করেছেন কিভাবে বাজেটে বয়স্কভাতা, বিধবা ভাতা, অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ভাতা ইত্যাদি খাতে হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এ টাকার একটি বড় অংশ যায় গরীব মানুষের কাছে। ফলে, গরীব যাতে না মরে, তার একটা ব্যবস্থা হয়। অপরদিকে এই টাকার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ সরকারী কর্মকর্তা, মেম্বার-চেয়ারম্যান, রাজনৈতিক নেতা, এমপি - তাদের পকেটস্ত হয়। সমাজকল্যাণ মন্ত্রীর সততার জন্য যত সুনামই থাক না কেন, তিনি কি এ নিশ্চয়তা দিতে পারেন যে, বয়স্কভাতার প্রতিটা টাকা প্রকৃত সুবিধাভোগীদের কাছে যায়? একদিকে যেমন দায়িত্বরত সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে এ টাকার একটা অংশ দিতে হয়, অপরদিকে কাদেরকে এ টাকা দেয়া হবে তা নির্ধারন করে দেন স্থানীয় মেম্বার-চেয়ারম্যান, রাজনৈতিক নেতা ও এমপিরা। গত বছর সরকার বন্যাত্তোর কৃষি পূনর্বাসনের জন্য ১৮৫ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি কর্মসূচী গ্রহন করে যাতে মোট ৩১ লক্ষ প্রান্তিক কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার দেয়ার দাবী করা হয়। কর্মসূচীটি যে মহৎ ও উপকারী সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আসলে কতজন কৃষক এ কর্মসূচী থেকে সুবিধা পেয়েছে সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। চ্যানেল আই প্রচারিত শাইখ সিরাজের ‘হৃদয়ে মাটি ও মানুষ’ নামক অনুষ্ঠানের অনেকগুলি পর্বে বন্যাত্তোর কৃষি নিয়ে সরেজমিন প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। শাইখ সিরাজ প্রতিটি পর্বেই প্রান্তিক কৃষকদের

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন এবং জানতে চেয়েছেন তারা বিনামূল্যে বীজ ও সার পেয়েছেন কিনা। দেখা গেছে উপস্থিত দশ-বারো জনের মধ্যে মাত্র দু'এক জন এ সুবিধা পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন। তাহলে বাকি বীজ ও সার গেল কোথায়? আগামী বছরের প্রস্তাবিত বাজেটে কৃষি সহায়তার পরিমান অনেক বাড়ানো হয়েছে। এটি নিঃসন্দেহে একটি অতি কলাণকর পদক্ষেপ। কিন্তু যদি কৃষকেরাই এর সুবিধা না পায়, তাহলে এখাতে হাজার হাজার কোটি টাকা ঢেলে কি লাভ? লাভ যে একবারে নেই তা নয়। ভোটের জন্য যাদের দরকার, তাদের পকেট ভারী হবে।

গ্রামীন জনপদের যোগাযোগ অবকাঠামো বাড়ানোর কাজটি করে থাকে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়। ফলে এ মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন বাজেট বাড়ানো যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। গত বছরের ৩৫৭৬ কোটি টাকা থেকে ১২৩২ কোটি টাকা (৩৫%) বাড়িয়ে এবছরে করা হয়েছে ৪৮০৮ কোটি টাকা। স্থানীয় সরকার বিভাগের উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর ব্যাপারে বলা হয়ে থাকে যে, এটি হচ্ছে ক্ষমতাশীন দলের সাংগঠনিক কর্মকান্ডের বাজেট; কেননা, উপজেলা ও গ্রাম পর্যায়ের রাস্তাঘাট ও ব্রীজ-কালভার্ট নির্মানের কাজ ক্ষমতাশীন দলের স্থানীয় নেতারাই পেয়ে থাকেন। সম্ভবতঃ এ কারনেই এ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেয়া হয়ে থাকে ক্ষমতাশীন দলের মহাসচিবকে। এই সকল কন্ট্রাক্ট পাওয়া নিয়ে দলীয় কোন্দল, এমনকি খুন খারাবীর ঘটনাও কম ঘটে না। অনেক এমপির বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে যে, তাঁরা এসব কন্টাক্ট কাকে দেয়া হবে সে ব্যাপারে শক্তিশালী ভূমিকা রাখেন এবং এগুলো থেকে একটি কমিশন নেন। ফলে বর্ষা পেরোতে না পেরোতেই রাস্তায় গর্ত হয়ে যায়, বছর না ঘুরতেই কালভার্টে ফাটল দেখা যায়।

প্রস্তাবিত বাজেটের (এবং অতীত বাজেট সমূহের) শুভংকরের ফাঁকিটি এখানেই। যে সব খাতে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয় তার যৌক্তিকতা নিয়ে কোন প্রশ্ন তোলার অবকাশ থাকে না। বরং প্রশ্ন রয়ে যায় সে অর্থের কতটুকু প্রকৃতই উক্ত উদ্দেশ্যে ব্যয় হয়েছে আর কতটুকু গেছে সরকারী কর্মকর্তা ও রাজনৈতিক নেতাদের পকেটে গেছে - সে বিষয়ে। কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর কোন বাজেটেই থাকে না, এ বাজেটেও নেই। বিশ্ব ব্যাংকের এক রিপোর্টে কিছুদিন আগে বলা হয়েছিল যে, আমাদের জিডিপির প্রায় অর্ধেকই নষ্ট হয়ে যায় দূর্নীতির কারনে। দূর্নীতির প্রতি সব সরকারের দূর্বলতাই সমান। বিদেশীদের চাপে সরকার একটি দূর্নীতি দমন কমিশন গঠন করেছে। কিন্ত সাথে এমন গ্যাঁড়াকলে কমিশনকে ফেলে রেখেছে যে তার থেকে মান সম্মানের সাথে বেরোনোর কোন পথ তার সদস্যেরা দেখতে পাচ্ছেন না। মন্ত্রী-সচিবদের অগনিত গাড়ীর বিষয়ে জানতে চেয়ে চিঠি দেয়াতে তাঁদের চাকরী টেকানো দায় হয়ে পড়েছে; দূর্নীতি দমন কখন করবেন। বলা হয় নাকি বুড়ো কালে নতুন চাকরী আর তরুনী ভার্যার মত আকর্ষনীয় আর কিছু থাকে না।

গত দুই হালি বাজেটের মত এ বাজেটেও দূর্নীতিবাজদের বাঁচার রাস্তা খোলা রাখা হয়েছে। আপনি আপনার জমানো টাকার শতকরা সাতভাগ বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা দিয়ে দিলে কেউ আর জানতে চাইবে না যে, আপনি সে টাকা কোথা থেকে পেয়েছেন। কি সুন্দর ব্যবস্থা! আপনি ঘুষ খেয়ে, চোরাচালান করে, লুটতরাজ ও চাঁদাবাজি করে টাকা উপার্জন করেন, কোন অসুবিধা নেই। মানি হ্যাজ নো কালার। অর্থমন্ত্রী বলছেন এ ব্যবস্থা বহাল রাখা হয়েছে (ব্যবস্থাটি বেশ পুরানো) অবৈধ টাকা অর্থনীতিতে বিনিয়োগের ব্যবস্থা করার জন্য। কথাটি বিশ্বাসযোগ্য নয় এ কারনে যে, কালো টাকা সাদা করার সুযোগ দেয়ার পাশাপাশি যারা সে সুযোগ নেয় না, তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে দেখা যায় না। ঢাকার অভিজাত এলাকার অধিকাংশ এপার্টমেন্ট মহিলাদের নামে। তার সাথে নারীর ক্ষমতায়নের কোন সম্পর্ক নেই। বরং অবৈধ টাকার মালিকদের আড়াল করতেই এসব করা হয়। এদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা কোন সরকারই নেয় না। ফলে দীর্ঘদিন ধরে কালো টাকা সাদা করার ব্যবস্থা থাকলেও খুব কম পরিমান কালো টাকা সাদা হয়েছে। দেখা যায় যে, কালো টাকার মালিকরা তাদের টাকার অত্যন্ত ক্ষুদ অংশ সাদা করেন। কারো হয়তো দশ

কোটি অবৈধ টাকা রয়েছে। তিনি একটি ফ্লাট কিনবেন ষাট লাখ টাকা দিয়ে। সরকারকে তিনি দেখাবেন যে, ফ্লাটের দাম পঁচিশ লাখ আর সে পরিমাণ টাকাই তিনি সাদা করবেন। কালো-সাদা এই শব্দ দুটিও পরিবর্তন করা উচিৎ। কালো মানেই খারাপ - এ ধারনার কারনে আমাদের দেশে লক্ষ লক্ষ নারীর জীবনে অন্ধকার নেমে আসে। তাছাড়া কালো বললে অবৈধ টাকার সাথে জড়িত অপরাধকে প্রকারান্তরে আড়াল করা হয়। ঘুষ ও দুর্নীতি বন্ধের কোন কার্যকর ব্যবস্থাগ্রহনের কথা অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতায় নেই, নেই সততা ও নৈতিক মূল্যবোধের বিস্তারের কোন পরিকল্পনার কথা। রাজনীতি ও প্রশাসনকে দূর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত রেখে জাতীয় বাজেট যত বেশী বাড়ানো হবে, সাধারন মানুষের ভোগান্তি ততো বাড়বে। কেননা, এই বাড়তি টাকা যোগাতে হবে তাদেরকেই। তাদেরকেই বিদেশী ঋণের বোঝা কাঁধে নিয়ে বেড়াতে হবে। সর্বগ্রাসী দূর্নীতির কারনে সরকারের রাজস্ব আদায়ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারে না। অবশ্য যে সরকার দূর্নীতির অভিযোগে কারাদন্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে সবথেকে দূর্নীতিপ্রবন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দিতে পারে, তার কাছে দূর্নীতি রোধের আশা করা অরণ্যে রোদন ছাড়া আর কিছু হবে বলে মনে হয় না।

আমাদের বাজেটের আরেকটি বৈশিষ্ট হচ্ছে যে, বিশ্ব ব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মূদ্রা তহবিলের মত ধনী দেশগুলির প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠানের দেয়া দিক-নির্দেশনা অনুসরন করে তা তৈরী হয়ে থাকে। তারা চায় না যে অনুন্নত দেশের গরীবেরা না খেয়ে মারা যাক। কেননা, তাতে একদিকে যেমন দেশে দেশে বিদ্রোহের আগুন জ্বলবে তেমনি তাদের তৈরী পণ্য বিক্রির বাজারও ছোট হয়ে যাবে। অপরদিকে, এ সকল প্রতিষ্ঠানে আমাদের প্রতিবেশী দেশের নাগরিকদের অতি উচ্চ হারে প্রতিনিধিত্বও বাংলাদেশের জন্য বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। ফলে প্রতিবেশী দেশটির বানিজ্যস্বার্থ যেন রক্ষা হয় সে ব্যবস্থা আমাদের সরকারগুলো সব সময়ই করে থাকে। একারনেই প্রতিবেশী দেশটির সাথে আমাদের বিশাল বানিজ্য ঘাটতি দিন দিন বেড়েই চলেছে। বাংলাদেশ উক্ত দেশটির পণ্যের জন্য প্রবেশাধিকার একযুগ আগেই দিয়ে রেখেছে অথচ বিনিময়ে সে দেশটি বাংলাদেশের কয়েকটি মাত্র পণ্যও ঢুকতে দিতে চায় না। বাংলাদেশ তাহলে কেন একতরফাভাবে এ সিদ্ধান্ত নিল? দুটি স্বাধীন দেশ। একজন তার দুয়ার এতোটুকু খুলবে না, অপরজন তার দরজা পুরোই খুলে দিল। কারন হিসাবে বিশ্বব্যাংক থেকে ঋণ নেয়ার শর্তের কথা বলা হয়। প্রতিবেশী দেশটির প্রতি বিশ্ব ব্যাংকের এতো দরদ কেন? সংস্থাটির বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশীয় অফিসের উচ্চ পদে দেশটির নাগরিকদের প্রাধান্য ছাড়া অন্য কোন কারন চোখে পড়ে না।

ধনী দেশগুলি ও প্রতিবেশী দেশের বানিজ্য স্বার্থ রক্ষার জন্য শিল্পখাত, বিশেষ করে গনশিল্প খাতকে সবসময়ই বাজেটে নিরুৎসাহিত করা হয়। বতমান বাজেট এ ক্ষেত্রে সত্যিই দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। যেখানে প্রায় সকল মন্ত্রণালয়ের বাজেট গত বছরের তুলনায় বাড়ানো হয়েছে, সেখানে শিল্প মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দ গতবছরের মূল ও সংশোধিত উভয় বরাদ্দের তুলনায় প্রচুর পরিমানে কমিয়ে দেয়া হয়েছে। এ মন্ত্রণালয়ের জন্য গত ২০০৪-০৫ অর্থবছরের সংশোধিত বরাদ্দ ছিল ৪৮৪ কোটি টাকা যা কমিয়ে এবছর করা হয়েছে ২৯৭ কোটি টাকা। অর্থাৎ শতকরা প্রায় চল্লিশভাগের মত বাজেট কমানো হয়েছে। যেখানে দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্রে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে দারিদ্র বিমোচনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী হিসাবে দেখনো হয়েছে সেখানে এ মন্ত্রণালয়ের বাজেট হ্রাসের মাযেযা কি?

আমাদের নীতি-নির্ধারকগন গনশিল্পায়নের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হচ্ছেন। প্রতিবছর যে লক্ষাধিক ছাত্র-ছাত্রী কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হয়, তাদের অধিকাংশই বেকার থাকে। লাখখানেক টাকা বিনিয়োগ করার ক্ষমতা তাদের অধিকাংশেরই আছে। তাদেরকে যদি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি জ্ঞান ও নির্দেশনা দেয়া যায়, তাহলে তাদের অনেকেই দশ-বারোজন মিলে এক একটা শিল্প কারখানা স্থাপন করতে পারে। উচ্চ শিক্ষা গ্রহনের পর গ্রামে ফিরে গিয়ে চাষাবাদ করা

অনেকের জন্যই সামাজিক কারনে সম্ভবপর হয় না। কিন্তু শিল্প স্থাপনে সে বাধা নেই, বরং শিল্পপতির বিশেষ সামাজিক মর্যাদা রয়েছে আমাদের সমাজে। শিল্পায়নের কথা উঠলেই সরকারের নীতি নির্ধারকগন ঋণের দিকে জোর দেন। ঋণের থেকে বেশী প্রয়োজন উদ্যোক্তাদের কারিগরী জ্ঞান, দিকনির্দেশনা ও চাকরী না করে নিজে কিছু করার ব্যাপারে তাদেরকে উদ্বুদ্ধকরন। পাশাপাশি দেশে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর দাম যাতে আমদানীকৃত পণ্যে থেকে বেশী না হয়ে যায় সেভাবে কর কাঠামোকেও সাজানো প্রয়োজন। প্রস্তাবিত বাজেটে এ বিষয়গুলি দেখা যায় না।